Episode No. – 20

Impact of Climate change-harmful impact

-সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষে থেকে শ্রী অভিজিৎ বর্ধন

চরিত্র :	১।	সৌম্য দত্ত	–	বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৬০ বছর
	২।	সৈকত	–	শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৩৮ বছর
	৩।	মানস	–	শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ২৮ বছর
	৪।	কৌস্তভ	–	বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৩৮ বছর
	৫।	চান্দ্রেয়ী	–	শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৩৬ বছর
	৬।	রূপক দা	–	অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৬৬ বছর
	৭।	বাঁশরী	–	অধ্যাপক ও বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৫৮ বছর
	৮।	অমিত	–	বিজ্ঞানকর্মী, বয়স – ৩৪ বছর

সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের মিটিং-এ বিষয়টা নিয়ে বেশ হৈচৈ হয়ে গেল। সদস্য-সদস্যাদের অধিকাংশই শিক্ষক/শিক্ষিকা – কারণ গরমের ছুটি কমিয়ে এনে সরকারের বিশেষ নির্দেশিকায় সব স্কুল খুলে দেওয়া হল জুন মাসের ১০ তারিখে। ঠিক যখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম।

আজকের মিটিং এর উদ্দেশ্য 'জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেলাভিত্তিক কাজের পর্যালোচনা করা।

যেসব জেলায় এখনও কাজ শুরু হয়নি সেখানে গিয়ে এখনই সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু জুন মাসের ২য় সপ্তাহে যখন ইতিমধ্যেই বর্ষা এসে যাওয়ার কথা, সেখানে বৃষ্টির নাম গন্ধ তো নেইই উল্টে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম।

গত শুক্রবার সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের বৈকালিক জমায়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা কজন। সৈকত, দীপেন, মানস, চান্দ্রেয়ী, বাঁশরী , কৌস্তভ, রায় বর্ধন কাকু ও রূপক হোম রায়। সকলেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। সেই সঙ্গে সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের সক্রিয় সদস্য এবং বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য বিজ্ঞান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। সকলেই আমরা গরমে হাঁসফাঁস করছি, চেষ্টা করছি পাখার ঠিক নীচে বসতে এমন সময় আগমন হল ফোরামের এক পুরনো বন্ধুর। সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের গোঁড়ার দিককার সক্রিয় সদস্য সৌম্য দত্তের।

সৌম্য এই মুহূর্তে দিল্লীতে থাকে আর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভারতে শুধু নয় আন্তর্জাতিক স্তরের একজন সক্রিয় কর্মী। চরকির মত ঘোরে এদেশ থেকে সে দেশ। আমরা বলি সৌম্য'দার দুটো ডানা আছে নইলে এবেলা লন্ডনে তো ওবেলা

টোকিও, পরদিন আবার ব্রেকফাস্ট করছে আমাজনের ধারে কোন গেস্ট হাউসে বসে। সৌম্য বসতে না বসতেই শুরু করল এই যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সারা বিশ্বে হৈচৈ হচ্ছে সে ব্যাপারে সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরাম কি ভাবছে ? নানা দেশের মানুষজন ছোট থেকে বড় সবাই পথে নেমেছে। সুইডেনের একটা বাচ্চা যে আলোড়ন তুলে দিয়েছে সারা বিশ্বে দেরিতে হলেও মানুষ শুরু করেছে ভাবতে, সে বিষয়ে তোমাদের মতামত কি ?		
সৈকত	:	বলে উঠলো "আমরা তো তোমার থেকেই শুনতে চাইছি কারণ উত্তরমেরুর এস্কিমো থেকে আমাজনের জাগুয়ার সবাই তো তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা তোমাকেই Whatsapp করে জানায়"।
সৌম্য দত্ত	:	(কিছুটা গম্ভীর হয়ে) "সব কথা এতটা হালকা ছলে নেবার মত অবস্থা আর আছে কি ?"
মানস	:	মুচকি হেসে কথা মানে তো "শব্দ তরঙ্গ" যা বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগোয়। সেটা হালকা হওয়া মানেই তো বাতাসের চাপ কম। তাতে যদি ঝড়-বৃষ্টি হয় তো ভালই, গরম কিছুটা কমবে। মানস শেষ করার আগেই ধমকে উঠল কাকু "এই সব ফাজলামি একটু কম করে ও যখন এসেছে ওর থেকে বিষয়টা একটু শোনই না। সব শয়তানগুলো এখানে জড়ো হয়েছে।
সৌম্য দত্ত	:	কাকুর সমর্থন পেয়ে কিছুক্ষণ থেমে রইল। তারপর জলের জগ থেকে কিছুটা জল গলায় ঢেলে ধীরে ধীরে শুরু করল "এখানে শুধু নয় সব দেশেই অনেক জ্ঞানীগুনি মানুষ যারা এতদিন বিষয়টাকে আদৌ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।
কৌস্তভ	:	কিন্তু সমস্যাগুলো ঠিক কোথায় কি কারণে ঘটছে ? আর লোকে জানতে চাইলে কীভাবে তাদের বোঝাব ?
সৌম্য দত্ত	:	সারা বিশ্বে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। যেমন এখানে তো এখন বর্ষা হবার কথা কিন্তু বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। উল্টে জুনের শেষেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। মৌসুমী বায়ু যা আমাদের দেশে বর্ষা আনে তার দিক বদল হয়ে পাহাড়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে আর সমতলে কমছে। এই তো আমি উত্তরবঙ্গ থেকে আসছি ওখানে তো প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে।
চান্দ্রেয়ী	:	হ্যাঁ হ্যাঁ মুম্বাইতে গত কয়েক বছর ভীষণ বৃষ্টির ফলে বন্যা হচ্ছে।
সৌম্য দত্ত	:	ঠিক ! সেই সঙ্গে গোটা বিশ্ব আরও বেশী করে হ্যারিকেন, টর্নেডো, এল নিনো প্রভৃতি সম্মুখীন হচ্ছে। আর এই অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত বৃষ্টিপাত ডেকে আনছে ভয়াবহ বন্যা। যেকোন আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল খুললেই দেখতে পাবে কীভাবে একটার পর একটা দেশে বন্যার প্রকোপ বাড়ছে, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। নষ্ট হচ্ছে লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ।
মানস	:	এখন BBC বা CNN খুললেই খালি বন্যার দৃশ্য।
সৌম্য দত্ত	:	শুধু কি তাই দুই মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সমুদ্র তীরবর্তী শহর এবং গ্রামগুলো জলমগ্ন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই যার লক্ষণও দেখা দিয়েছে অনেক জায়গাতেই। আর বিশ্বের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এবং প্রায় দশ কোটি মৎস্যজীবী পরিবার বাস করে সমুদ্র তীরবর্তী এই সব নিচু জমিতে তারা সবাই উৎখাত হবে তাদের ভিটে মাটি থেকে। এদের বেশীরভাগই গরীব মানুষ।

		উৎখাত হলে এরা আরও গরীব হবে। আর যারা যত গরীব হয় এইসব বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে তাদের তত বেশী সময় লাগে।
অমিত	:	কথাগুলো ঠিকই। আর এসবের অনেক খবরই আমরা রাখিনা।
সৌম্য দত্ত	:	আর এখন তো সারা বিশ্বের কাগজগুলোতেই 'পরিবেশ' এর পাতায় 'হিমালয়' একটা বড় ইস্যু।
মানস	:	কি রকম ?
সৌম্য দত্ত	:	কয়েকটা তথ্য দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। কেন হিমালয়ের হিমরেখা অর্থাৎ যে রেখার ওপর সারা বছর বরফ থাকে সেটা প্রায় ১০০০ মি. ওপরে উঠে গেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ যেখান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে সেটা প্রতি ১৫ বছরে ১ মাইল করে ছোট হচ্ছে। ভেবেছো ! হিমালয়ের হিমবাহগুলো না থাকলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু এইসব নদীগুলোর কি করুন দশা হবে। ভারতবর্ষের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ আর থাকবে ? আর এটা শুধু ভারতের একার সমস্যা নয় কম বেশী সব মহাদেশই ভুগছে এই সমস্যায়। আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতে বরফের আস্তরণ বিগত ৩০ বছরে কমে গেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। আল্পেস, আন্দিজ, রকি সব পর্বতমালাই আজ বরফের মুকট হারাতে চলেছে। সেই সঙ্গে কমে আসছে ঐ সব পর্বত থেকে নেমে আসা নদীগুলোতে মিষ্টি জলের পরিমাণ।
মানস	:	বুঝলাম, এতক্ষণ তো সবটাই দুঃশ্চিন্তা বাড়ানোর কথা বললে। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছে কারা। বড় বড় বিজ্ঞানী বা দেশনেতারা কি ভাবছে ?
সৌম্য দত্ত	:	কেউ যে একদম ভাবছে না তা নয়। তোমরা IPCC র কথা শুনেছ তো ?
চান্দ্রেয়ী	:	তা শুনেছি, তাও তুমি একটু ডিটেলে বল।
বাঁশরী	:	এটা আমিই বলছি। সৌম্য ততক্ষণে চা'টা খেয়ে নাও।
সৌম্য দত্ত	:	হ্যাঁ ক্ষিদেও পেয়েছে। অনেক দিন পর সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের গরম সিঙ্গারা আর চা। তবে এটা রোজ রোজ চললে Global Warming তো একা সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামই ডেকে আনবে। (সবাই হেসে উঠল)
বাঁশরী	:	ইন্টার গভরনমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সারা বিশ্বের বাছাই করা ৩৫০ এরও বেশী বিজ্ঞানী কাজ করছে এই IPCC র সঙ্গে। ১৯৯০ সালে তারা একটি রিপোর্ট পেশ করে তাতে বলা হয় বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বেড়ে চলেছে এবং যার কারণেই আবহাওয়ার পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে এবং এখনই ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে এর পরিণাম মারাত্মক হবে। IPCC র এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি সম্মেলন করে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরো শহরে। যা 'রিও সম্মেলন' নামে বিখ্যাত। সম্মেলনে প্রায় সবাই একমত হয় পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী মূলত কার্বন-ডাই-

		অক্সাইড বা CO_2 এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোই যে বেশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে তা আপত্তি থাকলেও প্রায় সবাই মেনে নেয়। IPCCর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রায় ০.৭৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে এই একুশ শতকের শেষ ভাগে উষ্ণতা সর্বোচ্চ ৬.৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বাড়তে পারে। বিশ্বের পথিকৃত ৩০টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানও তাদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছে। গবেষণা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ছিল ০.২°সে. – ০.৪°সে.। ১৯২১ – ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই হার ছিল ০.৪৫°সে.। আর ফেলে আসা ৯০ এর দশকে যা বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। বিশ শতকের উষ্ণতম বছর ছিল ১৯৯৮। আর তাকেও ছাপিয়ে যায় ২০০৫ এর গ্রীষ্মকাল। (ইতিমধ্যে কৌস্তভ গুগল খুলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সংজ্ঞা বার করে ফেলেছে)।
কৌস্তভ	:	সবাই শোন এখানে কি বলছে "বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল এবং সমুদ্রের জলের গড় তাপমাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকেই বলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। এখানে আরও আছে। প্রায় একশো বছর আগে বিজ্ঞানী 'আরহেনিয়াস' বলেছিলেন "মানুষ যে হারে খনিজ জ্বালানীকে ব্যবহার করছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু ঐ যুগে এই উক্তিকে "অরণ্যেরোদন" ছাড়া আর কিছু ভাবা যায়নি। এরকম আরও কতগুলো সাবধানবাণী বেশ কিছু বিজ্ঞানী শোনাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন ১৯৫০ এ বিজ্ঞানী স্নোডার তথ্য প্রমাণ দিয়ে বলেন যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৩০০ পিপিএম থেকে বেড়ে ৬০০ পিপিএম হলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর চেয়েও বেশী বৃদ্ধি পাবে। ১৯৫৮ সালে আমেরিকার ক্রিপস ইন্সিটিউট অফ ওসানোগ্রাফি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কার্বন- ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব মাপার চেষ্টা করে। দেখা যায় সত্যি সত্যিই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ছে। এই ধরণের ছোট বড় অনেক উদ্যোগই নানা দেশে সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বায়ুমণ্ডলে ওজনস্তরের ছিদ্র আবিষ্কার করে। আর এই ইস্যুতে ক্যালিফনিয়ায় ৫ লক্ষ লোকের একটা বিশাল মিছিল বার হয় ঐ বছরের ২২শে এপ্রিল। এই রকম একাধিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই ১৯৭২ এর বিখ্যাত ষ্টকহোম বিশ্ব সম্মেলন বা বসুন্ধরা বৈঠক যাতে যোগ দেন বিশ্বের ১১৫টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা। এর পর থেকে সারা বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা জোরদার হয়। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি স্তরে নেওয়া হয় অসংখ্য উদ্যোগ। নানা দেশের আইন সভায় পাশ হয় পরিবেশ বান্ধব একাধিক আইন।
মানস	:	তাহলে এতো দেশে এতো উদ্যোগ যখন নেওয়া হচ্ছে তখন এতো চিন্তার কি আছে। [চা-সিঙ্গারা খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে সৌম্য দত্ত এবার নড়েচড়ে বসল। তার পর টেবিলে ল্যাপটপ রেখে বেশকিছু টেবিল চার্ট দেখাতে দেখাতে বলল……]
সৌম্য দত্ত	:	কেন চিন্তিত তা এই সব টেবিল গুলো দেখলে বুঝতে পারবে। আবহাওয়ার চরিত্র বদলের সঙ্গে

		সঙ্গে যে ঘটনাগুলো সারা বিশ্বে ঘটছে সেগুলো লক্ষ্য কর। IPCC প্রায় ১০ বছর আগের এক রিপোর্টে যা যা ভবিষ্যতবাণী করেছিল সেগুলো হলঃ ১। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়বে। ২। আরও ঘন ঘন উষ্ণ সময় আসবে। ৩। গ্রীষ্ম প্রধান নয় এমন দেশগুলোতেও তাপপ্রবাহ চলবে। ৪। বর্ষার সময়কালের বাইরেও ভারী বৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে নিয়ম মত বর্ষার সময় বৃষ্টি হ্রাস পাবে। ৫। সূর্যালোকের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বছরে বেশীরভাগ সময়টা মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। ৬। মৌসুমীবায়ুর দিক পরিবর্তন হবে। আর এর সবগুলো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। কিছু দিন আগে সারা ইউরোপসহ উত্তর আমেরিকার জনজীবন দুর্বিষহ হয়েছে তাপ প্রবাহে। বরফের দেশ আলাস্কায় তাপমাত্রা পৌঁছেছে ২১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। ঠিক যখন দক্ষিণ গোলার্ধে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে ভয়াবহ বন্যায়।
মানস	:	এই টেবিলটা কীসের !
সৌম্য দত্ত	:	এটা IPCCর গবেষকদের তৈরি। ঝড়, দাবানল, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এই কটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর বিগত তিরিশ বছরের তথ্য রয়েছে এখানে।
সৈকত	:	ল্যাপটপটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলল এতো সাংঘাতিক। এখানে দেখাচ্ছে ১৯৫০ – ৬০, দশ বছরে বড় ঝড় হয়েছে ৫৯টা, ১৯৬০-৭০ এ এর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২১, ৭০-৮০ এই দশ বছরে যদিও ১২১টাই আছে। আবার ১৯৮০-৯০য়ে এটা বেড়ে হয়েছে ২০৭, ৯০-২০০১ এর সংখ্যা হল ৩০০। আর বিগত দশ বছরে সংখ্যাটি ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে। ঝড়ের পর আসা যাক বন্যায়। ৫০ এর দশকে সারা বিশ্বে বড় ধরণের বন্যার সংখ্যা ছিল '৫০'। ৬০ এর দশকে সেটা লাফিয়ে বেড়ে হয় '১১০'। নব্বই এর দশকে সংখ্যাটি দাঁড়ায় '৪৯০'। শেষ দশ বছরে সংখ্যাটি ৬০০ ছাড়িয়েছে।
সৌম্য দত্ত	:	ইন্টারেস্টিংলি এই টেবিলটাও দেখ। এখানে বলছে ৫০ এর দশকে সারা বিশ্বে তেমন ভয়ানক খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রায় দেখাই যায়নি। যদিও তার আগেই হয়ে গেছে ২য় বিশ্বযুদ্ধ। সেখানে ৯০ এর দশকে এসে বড় ধরণের খরা হয়েছে প্রায় দুশোটি। দুর্ভিক্ষ '৪৫' আর মহামারী ৩১৭টি। বিগত দশকে এই তিনটি বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষের। যখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে ৫০ এর তুলনায় প্রায় চার গুণ। বিজ্ঞানীদের মতে এই সবগুলোর সঙ্গেই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তন' এর। যার পেছনে প্রধান কারণ হলো বিশ্বের উষ্ণায়ন। এর প্রভাব পরিবর্তন হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা তাপমাত্রার কাঠামোর। আর এই তাপমাত্রার কাঠামোয় পরিবর্তন বদল আনছে মৌসুমীবায়ু, প্রবাহে। জলীয় বাষ্প বয়ে আনা মৌসুমি বায়ু কোথাও আসছে নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগে, কোথাও বা অনেক পরে। এর ফলে অনিয়মিত এবং অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বৃষ্টিপাত কোথাও হচ্ছে অনাবৃষ্টি যার ফলস্বরূপ খরা। কোথাও অতিবৃষ্টি পরিণতিতে বন্যা আর এর নীট ফল কৃষি উৎপাদন হ্রাস। যা ডেকে আনছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী।

		বিজ্ঞানীরা এও দেখিয়েছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত বাড়বে এলনিনো, হ্যারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতির মত প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগের সংখ্যা এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ততটাই বৃদ্ধি পাবে।
বাঁশরী	:	আরও একটা বিষয় নিয়ে এখন মেডিকেল জিওগ্রাফিতে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। গত দশ বছরে বিশ্বের ৪৮% স্থানে এমন এমন রোগ ছড়িয়েছে যেগুলো ৫০ এবং ৬০ এর দশকে কেবলমাত্র নিরক্ষীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর মূল কারণও এই জলবায়ু পরিবর্তন। যা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মত রোগের জীবাণুর জীবনচক্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এনেছে। যার ফলে এতদিন ধরে চলে আসা ঔষধ প্রতিষেধক আর কাজ দিচ্ছে না। নাসার উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারত মহাসাগরের ওপর জমে আছে বাদামী রঙের মেঘ। সারা বছর মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ওপর এই মেঘ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছে এশিয়ান ব্রাউন ক্লাউড। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওঠা জলীয়বাষ্প আর বাতাসের ভাসমান ধূলিকণার থেকে এর সৃষ্টি। এই মেঘের প্রভাবে একদিকে যেমন আবহাওয়া গরম হচ্ছে। অন্যদিকে তেমনই সূর্যরশ্মি সরাসরি প্রবেশ করতে না পেরে স্যাতে স্যাতে আর্দ্রতাযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। গরম এবং আর্দ্র এই পরিবেশ রোগজীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে দারুণভাবে সহায়তা করে।
রূপক দা	:	এতক্ষণ তো গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ওপর আলোচনা হল বিজ্ঞানের নানা শাখাকে সামনে রেখে কিন্তু আমাদের মত জীববিজ্ঞানীদেরও এখানে কিছু বলার আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই যে বিশাল জীবভাণ্ডার যার সদস্য সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি। যুগে যুগে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে এদের মধ্যে কেউ কেউ লুপ্ত হয়ে যায় চিরতরে। আবার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতির। এই বিবর্তনটা ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে পরিবেশ পাল্টানোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এই ছন্দে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে আবহাওয়ার পরিবর্তন। অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে অস্বাভাবিক গতিতে। দুই মেরুতে বসবাসকারী পেঙ্গুইনের সংখ্যাও বিগত দশ বছরে ৪০% হ্রাস পেয়েছে। হ্রাস পাচ্ছে নদী পুকুরের মিষ্টি জলের মাছ থেকে কয়েক কিলোমিটার লম্বা সামুদ্রিক উদ্ভিদ। আজ সকলেরই অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে "জলবায়ু পরিবর্তন" এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারায়। একই ঘটনা ঘটছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এক আশ্চর্য বাস্তুতন্ত্রের কাজ করে যাওয়া সমুদ্রের কোরাল রীফে। কাজেই এই বিপর্যয় থেকে কেউই আজ নিরাপদ নয় নিরাপদ নই আমরা মানুষরাও। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। চেষ্টা করতে হবে কিছু একটা করার আরও বেশী দেরী হবার আগে।